ভয় – নির্ভয় আহমেদ সাবের

মোসাদেক আলী বারডেম হাসপাতালে ভাইপো শুক্তকেকে দেখতে এসেছিল। ক্লাস ফেরে পড়েছে বয়ি সরাই শুক্তকের পর্যায় ১২ দিন ধরে অবিরাম জল পানি আর অসুথ দিও তোমাদের নীচে নামানো যাচ্ছে না। পারবারিক ভাঙ্কার ধরতে পারছেন না, ব্যাপারটা কি। তাই পরামর্শ দিয়েছেন, কোন হাসপাতালে ভার করে ভালো মত চেক আপ করাতে। মোসাদেক আলীরা পুরানো ঢাকার আদি বাসিন্দা। সম্পর্ক টানলে ঢাকার নবাব বংশীর আত্মীয়। আরম্ভনীতরের প্রেক্ষিত বাড়ি। ইসলামপুরে কাপড়ের পাইকারী ব্যবসা আছে বংশানুক্রমে।

টাকা পয়সার অভাব নাই। তাই শুক্তকের বাপ তোফাজল আলী ছেলেকে সরকারী হাসপাতালে না নিয়ে শাহবাগে বারডেম হাসপাতালেই নিয়ে এসেছেন।

সকালে পুরো পরিবার হাসপাতালে এসেছিলো। শুক্তকেকে নিয়ে দুপুরের মধ্যেই শুক্তকের ঠাঁই হয়েছে চার তলার উপর সুন্দর একটা ছিমছাম কথা। এখানে ফেরে করা, পরীক্ষার জন্য রক্ত টক নেওয়া সব শেষ। ডাক্তার দেখে গেছেন কয়েক-বার। রাত আটটার দিকে তোফাজল আলী ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন গ্রীষ্মে রেখে। শুক্তকের মা রাতে থাকবেন ছেলের সাথে। মোসাদেক আলী গদিতে ছিল বলে সবার সাথে আসতে পারেনি; এসেছে সন্ধ্যার সময়। ঠিক করছে, ভাইপোকে রাত দশটা পয়ন্ত সঙ্গ নিয়ে থাকে সুষুম্ন বাড়ি ফিরবে।

মোসাদেক আলী বেশ গাড়া গোটা চেনারার বুক। ইচ্ছা করলে, কে কোন নাটক কিংবা সিনেমায় খুলুর চরিত্রে ওকে সহজেই নামিয়ে দেয়া যায়। পড়াশুনা বয়ব্ধ করেনি। এইস, এইস, সি ভিনবার ফেল করার পর, ভাইয়ের সাথে প্রেক্ষিত ব্যবসায় লেগে গেছে। বড় ভাই যাবার পর, মোসাদেক আলীর সিগারেট খাবার ইচ্ছা হলো। হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট থাওয়া নিরাপদ বলে নীচে নেমে এসেছিলো সিগারেট থেকে। নেমে দেখে, সিগারেটেও শেষ। তাই সিগারেট কিনতে ফুটপাতে এসেছে।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো মোসাদেক আলী, সাথে একটা পান। পয়সা দিতে যায়, এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এলো এক বিশ-বাইশ বছরের ছেলেকে।

এক প্যাকেট বেনসন দে তো। দোকানীকে হুকুম দিলো হেলেটা দরকার করলে।

নাছু ভাই, সকালেই ত নিনেন এক প্যাকেট। চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নীচু হয়ে বললো দোকানদার লোকটা। এখন আবার চাঁ।

কি কইলিং ...। একটা বাজে গালি দিলো ছোকরা। আর একটা কথা কবি ত, ছুড়ি ফালাইয়া দিমু।

দোকানদার লোকটা আর কোন কথা না বলে বেনসনের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো ছোকরার দিকে। ছোকরা প্যাকেটটা নিয়ে বীরের মত হেলে দুলে চলে গেলো।
এদের জুলায় কি কইরা ব্যবসা করি কন। মাসে মাসে চাঁদ দিতে হয়। তার উপর সময় নাই, গমন নাই, যখন তাম পান নেয়, সিগারেট নেয়, কোক-ফার্টা নেয়। নিজের মনের কঠোর উজাড় করে দেয় দোকানদার লোকটা।

মোসাদ্দেক আলী ভাবলো, হোকরাকে ডেকে বুঝা শুনিয়ে দেবে। নিজের এলাকা হলে তাই করতো।
কিন্তু হাসপাতালের এই অপরিচিত পরিবেশে তার সাহসে কুলালো না ওই হোকরাকে কিছু বলতে।
দোকানীকে পরমা দিয়ে পথে নামলো সে। পান্টা গালে পুরে, সিগারেট ধরিয়ে ভাবলো, একটু হাটবে এদিক ওদিক।
ঝুততে ঝুততে শাহবাগের মোড়ের টেলিস কমপ্লেক্স এর কাছে আসতেই লোকটার উপর নজর পড়লো তার।
একজন বুড়ো লোক - বয়স রোধ হয় ছাদের কাছাকাছি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে।
একটা বিদায় বোঝা হাতে, রাস্তার যানবাহনের অন্তহীন প্রাহারের দিকে যোগাযোগ দূষ্টি মেলে।
মোসাদ্দেক আলীর সিক্কে সেন্স বললো, লোকটা বোঝাহয় কোন বিপদে পড়েছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

মিয়া ভাই, কই যাইবার লাগছেন?

মোসাদ্দেক আলীর উঁচ কঠোর প্রশ্নে বুড়ো রুক্তম আলী চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন, সালোয়ার-কুর্তা গায়ে বিদায় একটা লোক তাকিয়ে আছে তার দিকে।
ঝুতের কোন বেয়ে পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন রক্ত বর্জ।
হাতে একটা জলদ সিগারেট।

হাসপাতালে যামু। কীন কঠোর বললন রুক্তম আলী।

হইছে কিছু? আবার বাজখানই গলায় প্রশ্ন।

আমার কিছু না। পোলাভার এডিনথেট হইছে। মানুষ জন হাসপাতালে লইয়া গেছে।
মোবাইলে কারা আমাকে ইন্ট্রুজ চেয়ারম্যানরে খবর দিলো।
তিনি আমারে খবরটা দিয়াছে কইলেন, হাসপাতালের নাকি অনেক খরচ - রক্ত কেনা, অর্থুত কেনা।
টাকা না পাইল পোলাভার চিকিৎসা হইবোনা।
আমি গিরস্ত মানুষ, টাকা পামু কই।
খাম দেনা কইরা ছুইটা আসলাম।

আইছেন কোহান থেইকা?

মহবদ্রত পুর। পাবনা থেইকা সাত মাইল দূর। বাসে এইখানে নামাইয়া দিলো একটু আগে।
পথ ঘাট চিনি না। এখনা কেমনে হাসপাতালে যাই........

ছেলে কি করতো?

কি আর করবো? রাজ-মিত্রির যোগালীর কাম করতো।
মাছ ভাইলা পইড়া হাত-পা বাঁচে, মাখায় চোট লাগছে।

কোন হাসপাতালে আছে?
ঢাকা হাসপাতাল।

ঢাকা হাসপাতাল? মোসাদেক আলী তাকায় স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে।

হ, ঢাকা হাসপাতাল। ইদ্রিস চেয়ারম্যান কাইছে, ঢাকার মহিষ্যে সব চে বড় হাসপাতাল। যারে কমু, হেই চিনাইয়া দিবা।

মোসাদেক আলী মন মন ভাবতে থাকে। প্রাইভেট হাসপাতাল হবার কথা নয়। সরকারী হাসপাতালগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যালের কথাই প্রথম মনে পড়লো তার।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল? বুড়োর দিকে আবার স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মোসাদেক আলী।

হ হ, ওই টই।

মোসাদেক আলীর বড় কষ্ট হল বুড়োর কথা শুনে। আহারে, ছেলের এক্সিডেন্টের কথা শুনে এতদূর থেকে ছুটে এসেছেন ধার দেনা করে। তাবালো, বুড়োকে একটা রিক্সা কিয়া কুটার ধরিয়ে দেয়া। কিতু সাথে তায়ালো, রিক্সা কিংবা ফুটারে হাসপাতালে পৌঁছালেও ছেলের সাক্ষাত্ত যে বুড়ো পাবে, তার কেন নিশ্চয়তা নেই। সেখানেও হাজার রকম দালাল বসে আছে, এ ধরনের লোকদের হেনস্তা করার জন্য।

সে মনে মনে ঠিক করলো, বুড়োকে হাসপাতালে ছেলের কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপর বাড়ী যাবে।

ঠিক আছে। হাসপাতালটা কাইছে। হাত তুলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে ইঙ্গিত করে মোসাদেক আলী। আপনে এখানে খাতান। আমি যামু আর আসমু। আমার ভাইপোডা আছে এই হাসপাতালে, সঙ্গে হের মা। বারডেমের দিকে দিকে ইঙ্গিত করে সে। ওগোর বইলা আসি। কোন চিন্তা নাই। আপনের আমি আপনার পৌঁছাতে হাত আসম। এখানে এখানে বইসা থাকেন। আমি যামু আর আসমু।

মোসাদেক আলী হনহন করে ছুটলো বারডেম হাসপাতালের দিকে। লোকজন কমে আসছে রাখিয়া।

যদিও সব কিছু দেখা হয়েছে, তবু তাবীর কাছে গিয়ে জানতে হবে, ওদের আর কিছু লাগবে কি না। নার্সদের সাথেও একটু আলাপ করে আসতে হবে, যদি শেষ মুহূর্তে কিছু প্রয়োজন হয়। সব কাজ সারতে কতক্ষন লাগে কে জানে। তার পর বাড়ী ফেরার পালা। পথে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পড়বে। বুড়োকে ওখানে নামিয়ে ছেলের সাথে দেখা করিয়ে তবে ছুটি।

ভাবছেন বুড়ো রক্ষা আলীও। নিজের বোকামিতে নিজের উপর রাগ হচ্ছে তার। চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী বাবার বলে দিয়েছেন, ঢাকা শহর হলো ঠকের মুল্লুক। কই যাবা, সবাই কথা না। মানুষে কিছু দিলে খাবা না। ভাড়ী ঘোড়া উঠেই সাবধান। এক যাগার নাম কইয়া অন্য যাগায় নিয়া তোমারে ফতুর কইয়া দিবা। যদি মারা এই লোকটাকে কেন যে সব বলতে গেলা। বিশেষ করে, ঢাকা পয়সার ব্যাপারটা। লোকটার কথা বাড়া সুবিধার না। কেমন কোটি কোটি করে কথা বলে। এখন লোকটা হয়তো
একেই কি করবে সে? রাস্তা ঘাট চিনলে না হয় পালানো যেত। হাতের বোঝাটাই বেশ তারী। ছেলের মা ছেলের জন্য অনেক খাবার দাবার দিয়ে দিয়েছেন। হাতের বোঝাটা না থাকলে একদিন চটপট সত্ত্বেও পড়া কঠিন ছিলো। রুক্তম আলী এক বার ভাবলেন, বোঝাটা কেলে রেখেই পালাবেন। কিন্তু ছেলের জন্য অনা খাবারগুলো ফেলে যেতে মন চাইলেনা তার। ভাবলেন, একটা রিক্সা নেনেন। কিন্তু সাহস হলো না।

রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশে যেতে পারলে লোকটার খাপের থেকে বাঁচা যেতে পারে, এই ভেবে রাস্তা পার হবার উদ্যোগ নেন রুক্তম আলী। কোমরটা যত্নীয় এক যোগে তুজে আসে তাকে, প্রচুর শব্দে হর্ষ বাধিয়ে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা খাঁচাহাড়া হবার যে। তাড়াতাড়ি পেছনে সরে আসেন তিনি। পেছনে সেই ষড়া মার্কা লেক, সামনে যানবাহনের অনস্ত মিছিল। তিন বারের চেতিয়া রাস্তা পার হয়ে তার মন হয়, তিনি আজকালের থাবা থেকে কোন মতে মুক্তি পেয়ে এসেছেন। শিব পার্কের পেট পেরিয়ে একটু সামনে একটা অষ্টকার যায়নীতে পেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে সুরা ইয়াসিন পড়তে থাকেন রুক্তম আলী।

এমন সময় মাটি ফুঁটে উদয় হল দুটো যুবক।

আছালাম-আলাইকুম চাচা। ওদের একজন বললে অতি মোলায়েম কছে।

চমকে উঠে রুক্তম আলী দেখেন, তাকে ঘরে যেপ-দুর্গন্ত কাপড় পরা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে।

ওয়ালাইকুম সালাম। উত্তর দেন তিনি।

কেমন আছেন চাচা? কই যাইবেন? আগের ছেলেটিই বললে। বাকী জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে।

একটু বসেন চাচা। দেখলাম, হাতে বোঝা লইয়া অনেককথা হইরা খাড়াইয়া আছেন। আহারে, বোঝা লইয়া আপনার কত কষ্ট হইতাছে। বসন, একটু জিবাইয়া লন।

ছেলে দুটো কে দেখে হালে পানি পেলেন রুক্তম আলী। যাই হোক, ওই গুড়া লোকটা এ দুটো ভদ্র ছেলের সামনে কিছু করবার সাহস পাবে না।

না না বাবা, আমার জিজ্ঞাসার সময় নাই। পোলডা একস্তেকটি কইরা হাসপাতালে। হের চিকিৎসার লাইগ টাকা পয়সা দর্শন। আমার এসকাল হাসপাতালে যাওন দরকার।

হায় হায়। কন কি! কোন হাসপাতালে?

মেডিক্যাল কলেজ না কি কয়, সেই হাসপাতালে।

কোন চিন্তা নাই চাচা। এই যে মাজাদ, সঙ্গীকে দেখায় ছেলেটা। ওর ভাই কাম করে অই হাসপাতালে। আপনার পোলার চিকিৎসার আর কোন চিন্তা নাই। চলেন, আপনারে হাসপাতালে লইয়া যাই।
একটি প্রচুর ভয় গ্রাস করেছিল রুক্তম আলীকে গ্রহনের মত। ডুজন ফেরেন্তা সেই গ্রহনের অঙ্কনকার কেটে মুক্ত করে নিয়ে যাছে তাকে। ভয় থেকে নির্ভয়ের পথে। মনে মনে খোদার কাছে হাজার শোকর আদায় করেন তিনি।

একটি বেবীত্যাঙ্কি থামে শিশু পার্কের সামনে, ফুটপাটের গা ঘেষে।

এই মাজেদ, মুরক্তীর সন্নাম করা এখনো শিখলি না। চা মিয়া কাঠ কাঠা বোখা টানতাছে, আর তুই নবাবের মত পাকেট হাত দিয়া হাটতাছস। তোর লজ্জা করে না? প্রথম ছেলেটার কথায় লজ্জা পায় মাজেদ।

পোটলাটা আমার হাতে দেন চা, বলে দেয়ার অপেক্ষা না করেই রুক্তম আলীর হাত থেকে বোঝাটা নিজের হাতে টেনে নেয় মাজেদ।

তিন জনের দলটি এগিয়ে যায় বেবীত্যাঙ্কিটার দিকে।

মোসাদেক আলী মোটা সোটা শরীর নিয়ে রীতিমত হাফাছে ফুটপাটের উপর। দেরী হবে বলে লিফটের জন্য অপেক্ষা করে নি। সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছে দৃঢ় বেগে। নীচে নেমেও থামেনি। একটুটু চলে এসেছে বুড়োকে বুড়োতে।

না, জায়গায় সেই বুড়ো। টেনিস কম্পেন্স এর সামনের ফুটপাটকা দুবার চকর দেয় সে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত। না, কোথায় নেই। কোথায় গেলে লোকটা? নিজেকেই প্রশ্ন করে মোসাদেক আলী। কই আর যাবে, আশেপাশে আছে কোথাও হয়তো। মনেক প্রবোধ দেয় সে। হঠাৎ রাস্তার উলটো দিকে, শিশু পার্কের গেটের পাশে তাকাতেই বুড়োর উপর চোখ পড়ে মোসাদেক আলীর।

হেটে যাছেন বুড়ো। একটি বেবীত্যাঙ্কির দিকে। তাকে ঘিরে ডুজন যুবক। লাইটপোল্টের আলোয় নান্দু নামের হাঙ্কাটাকে চিনতে কষ্ট হয়না তার। মোসাদেক আলী চল্মান গাড়ীর গ্রাহে উপস্থিক করে, দ্রুত করে রাখা গেলে হেডলা বেবীত্যাঙ্কিটার দিকে হাফাতে হাফাতে। বিদ্যু পৌঁছানর আগেই হেডে দিলো সোটা। শাহবাগের গোল চকর ঘুরে ছুটে চললো ফাঁর্ম গেটের দিকে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে পেছনে ফেলে।

আপস্মুয়ান বেবীত্যাঙ্কিটার পেছনের ছুটা লাল আলো যেন রঙু চক্ষ মেলে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

সিডনী এপ্রিল ২৪-২৫, ২০১০